ভারতীয় শিল্পাধ্যায়ের এক যুগাবসান : পরিতোষ সেন

অনিন্দ্যকান্তি বিশ্বাস

সৃষ্টিতেই সাধারণত শিল্পীকে আমরা পেয়ে থাকি। তবে ব্যতিক্রমী কিছু শিল্পীও রয়েছেন যাঁরা শুধুমাত্র আমাদেরকে সৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট করেননি—কৃষ্টিতেও আমাদেরকে দেন শান্তি ও স্বস্তির অনাবিল প্রলেপ বা আনন্দধারা। আর তখনই সেই শিল্পীকে আমরা একজন পূর্ণাঙ্গ শিল্পী সাহিত্যিকের আসনে উপবেশন করাই। দুই হাতই তখন তাঁর চলতে থাকে সব্যসাচীর মতো। এমনই এক শিল্পী ছিলেন সদ্যপ্রয়াত পরিতোষ সেন। তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী পাবলো পিকাসের সঙ্গে তাঁরই প্যারিসের স্টুডিও-তে।

বর্তমানে বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে ১৯১৮ সালের ১৮ অক্টোবর পরিতোষদার জন্ম। চলেও গেলেন এই অক্টোবরেই। নব্বইতম জন্মদিনটি কাটিয়ে ২২ অক্টোবর ২০০৮। অশীতিপর হলেও মনেপ্রাণে এই শিল্পী সবসময় ছিলেন চিরযুবা। যৌবন জলতরঙ্গের এক মূর্তিমান প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। সে কারণে বিনা আমন্ত্রণেও ছবি দেখা ও আজকের তরুণদের সাথে মানসিকতা ভাগ করে নিতে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছেড়ে রাজি হয়ে যেতেন কলকাতার নানান প্রদর্শশালায়। ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনাতেও কোনোরকম শিথিলতা ধরা পড়েনি কখনও। অগ্রজ সৎ দাদাদের অত্যাচারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কুলের গন্ডিতে ইতি টেনে অর্থাৎ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে পরিতোষ সেনকে পাড়ি জমাতে হয় দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ শহরে। এছাড়াও বালক পরিতোষের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর মায়ের চেয়ে বয়সে বড়ো আগের পক্ষের দাদাদের নেশার খোরাকের জন্য অসহায় বিধবার উপর অত্যাচার। ফলত, তরুণ পরিতোষকে ঢাকা ছেড়ে পালাতেই হয়। অপছন্দের শহর মাদ্রাজ-এ। সেইসময় দশাসই চেহারার রবীন্দ্র ও অবনীন্দ্র স্নেহধন্য শিল্পী দেবীপ্রসাদের মূর্তিকর ও চিত্রকর হিসাবে বেশ নামডাক, (শিল্পী) দেবীপ্রসাদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বৈপরীত্যে ভরপুর এই শিল্পী একদিকে যেমন ছিলেন কুস্তিগীর অথচ বাঁশি বাজিয়ে , শিকারী অথচ বীভৎস ও অদ্ভুতরসের কাহিনি লেখক। তিনি জন্মসূত্রে যেমন ছিলেন জমিদারনন্দন চরিত্রগতভাবে বিপরীতদিকে তেমনিই ছিলেন বাউন্ডুলে বোহেমিয়ান স্বভাবের। স্পষ্ট বক্তা হিসাবে দেবীপ্রসাদের জুড়ি মেলা ভার। বাড়ি পালানো ছাত্রদের তিনি দিতেন আশ্রয় ও নির্ভরতার মন্ত্র। পিতা ও বন্ধুর মতো স্বভাবের এই আশ্রয়দাতাকে সকলেই পছন্দ করতেন অন্যান্য আরও নানান আনুষঙ্গিক গুণের কারণে। একটু অতীতের পাতা ওল্টালেই আমরা দেখতে পাই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার আগেই পরিতোষ সেন ঠিক করেন আর্ট কলেজে ভর্তি হবেন এবং এটাকেই পেশা হিসাবে বেছে নেবেন। প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়ে যায় পরিতোষদার কথাতেই— ''প্রায় চৌদ্দো বছর বয়সেই ঠিক করে ফেলি ছবি আঁকাই করবো। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তখন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। ওনার ছবি ভালো লাগতো। তাঁকে চিঠি লিখে মনের আর্জি জানাই আপনার কাছে অর্থাৎ আপনার আর্ট স্কুলে শিখতে চাই। উনি বলেন, আগে স্কুলের পাঠ শেষ কর আর তারপর চিঠি লিখবে আর সঙ্গে পাঠাবে নিজের ছবি। ১৬ বছর বয়সে সেটাই করলাম। দেবীবাবু ছবি দেখে জানালেন ভর্তির আশ্বাসবাণী। ফলত, ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে দেখাও করলাম কলকাতা শহরে। এরপরে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে প্রবেশ ১৯৩৭ -এ। সেখানে সকলে মিলেই কাজ করতাম। সিনিয়র হিসাবে পেয়েছি গোপাল ঘোষ ও প্রদোষ দাশগুপ্ত প্রমুখকে। এসবের পিছনে মা হেমাঙ্গিনী দেবীর উৎসাহ পেয়েছি। সকলের কাজ সকলেই দেখতাম, উনি কাজ করতেন সেটাও দেখতাম। তিনি কাজ দেখিয়ে দিতেন আর আমরা মনোযোগ সহকারে শিখতাম।''

পরিতোষ সেন - এর প্রথম শিক্ষাগুরুর সঙ্গে রামকিঙ্কর বেইজের প্রথম শিক্ষাগুরুর একটি অভূতপূর্ব মিল আমরা পেয়ে যাই। দু'জনেরই শিক্ষাগুরু কোনো আর্ট স্কুলের পাঠ নেননি অথচ তাঁদের শিক্ষা সম্পর্কে পরিতোষ সেন এবং রামকিঙ্কর বেইজের অগাধ শ্রদ্ধা এবং আস্থা ছিল। রামকিঙ্কর বেইজ যেমন কায়মনোবাক্যে মৃৎশিল্পী অনন্ত সূত্রধরের কথা বারংবার বলতেন, সেরকমটি পরিতোষবাবুর কথাতেও উঠে আসতে দেখতে পাই— ''জিতেন গোঁসাই বা গোস্বামীর আসল পেশা ছিল থিয়েটারে সিন সিনারি আঁকা। বাঁশে আটকানো মস্ত বড় থান কাপড় ছাদ থেকে ঝুলে মেঝে অবধি নেমে আসতে দেখেছি। চারিদিকে অসংখ্য ছোটবড় হাঁড়িকুড়ি, কৌটো, গ্লাস, ময়লা খবরের কাগজ ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকতো। বালতিতে অথবা ধোপার গামলায় ময়লা, আধময়লা পরিষ্কার জল রাখা থাকতো। পাশেই দেখেছি নানান সাইজের লম্বা লম্বা তুলি এবং সেগুলো জলে ডোবানো। জুতোর ব্রাশও এদের সঙ্গে সহাবস্থান করত। ঘরের শেষ দেওয়াল ঘেষে মাটিতে খাড়া বা শোয়ানো অবস্থায় দেখেছি অনেকগুলো খালি বোতল— সেগুলি যে ওষুধ বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত বোতল নয় তা তাদের গাত্রদেহ দেখলে সহজেই বুঝতে পারতাম। এগুলোর কাছাকাছি তাকে সারি সারি দেখেছি ময়লা ছোঁড়া পাতার বেশ কিছু নাটকের ও অন্যান্য বিষয়ের বইপত্র।''

ছোটবেলাতেই অর্থাৎ স্কুলজীবনের শেষের দিকে জিতেনবাবুর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটে পরিতোষ সেন - এর। তাঁর কথাতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে জিতেন গোস্বামীর কাজের মূল্যায়ন— ''একেকদিন লেখাপড়া, খেলাধুলা ইত্যাদি ভুলে গিয়ে আমি এই লোকটির ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা এবং প্রতিভার বিকাশ ঘন্টার পর ঘন্টা বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। পরম আশ্চর্যের বিষয় এই নিঃসঙ্গ ও ঘোরতর একাকিত্বের উপাসক আমার প্রতি কেবল স্নেহপ্রবন ছিলেন না— ছিলেন চরম আস্থাশীলও। এর কারণ হয়তো এই যে, তাঁর কাজ দেখে সাধারণত বাকশূন্য থাকলেও আমি যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণমুগ্ধ ও প্রশংসাকারী একথা আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ও দু'একটি কথাবার্তায় বুঝতেন। অথচ আমি এও দেখেছি কোনো পথচারী তাঁর কাজে আকৃষ্ট হয়ে থেমে যেত, তবে বিরক্তিবোধ করতেন এবং তৎক্ষণাৎ গুরুগম্ভীর স্বরে বলতেন—'যাও, আগে বড়ো।' কথাটি শুনে সাধারণত সেখানে দাঁড়াবার সাহস কেউ দেখাত না। যদি বা কখনও সখনও তাঁর আওয়াজ পথচারীর কানে না পৌঁছুলে ডিব্বায় গোল রঙ তাদের দিকে ছুঁড়ে দিত। আসলে একাকিত্ব এবং নির্জনতা তাঁর কাছে এতই মূল্যবান ছিল যে (সে) দুটিকে তিনি যক্ষের ধনের মতো আগলে থাকতেন। এবারে পুনরায় যাওয়া যাক পরিতোষদার মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের শিক্ষাপর্বের ঘটনায়। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ছাত্রদের কাছে ছিলেন বন্ধুর মতো আর তাঁর কাছে ছাত্ররা ছিল পুত্রসম। নানাভাবে তিনি ছাত্রদের প্রায়শই উস্কে দিতেন কাজের তাগিদে এবং বলতেন— ''যা করছো ভালো করে কর।'' সবসময় ছাত্রদেরকে তৎপর রাখতেন, ভাবাতেন তারা কী করবে না করবে সে ব্যাপারে। এছাড়াও নানাভাবে বোঝাতেন কীভাবে আরও ভালো কাজ করা যায়—ওনার সর্বদা একটাই কথা ছিল— ''কাজ চাই''। গতানুগতিক ক্লাসে উপস্থিতি দেবীপ্রসাদ মহাশয়ের কাছে বড়ো কথা ছিল না—সব সময়েই বলতেন জুতে যাও, স্টেশনে বসে রাস্তাঘাটের দৃশ্য আঁকো ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসময়েই পরিতোষ সেন প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পেয়েছেন অগ্রজ ছাত্র গোপাল ঘোষ- এর কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে পরিতোষদার কথা— ''গোপালদার কাছ থেকেও শিখেছি প্রচুর, যেমন শিখেছি দেবীবাবুর কাছ থেকে। গোপাল ঘোষ - এর কাছ থেকে বিশেষভাবে শিখেছি স্পট স্ট্যাডি। স্পট স্টাডি করবার সে কত রকমের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ, দেখবার কৌশল এবং সময়ের মূল্য কাকে বলে এবং কিভাবে তা মেটাতে হয় সে সমস্ত শিখেছি গোপালদার কাছ থেকেই। অগ্রজ হলেও সবসময়ই ব্যবহার ছিল বন্ধুসম।'' আর্ট স্কুলে (কলেজের) শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গে

পরিতোষদার যে কথাটি আগের কথাগুলোর সঙ্গে বারবার উঠে অসাতে দেখি সেটি হল—আমাদের আর্ট স্কুলে দ'রকম ক্লাস হত। সকালে ফিগার স্টাডি, সরাসরি মডেল দেখে আঁকা আর বিকেলে মন থেকে আঁকা। এই মডেল স্টাডির সময় প্রথম বিবস্ত্র মডেল দেখি। আমার ছবিতে গোলমাল হচ্ছিল নারীর বক্ষোদেশ আঁকতে গিয়ে। এই দেখে দেবীবাবু বললেন— 'এ কী এঁকোছো? নারীর বক্ষস্থল কী সাইকেলের চাকা। যাও বাড়ীর পাশে কলকাতায় মাঝে মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখো।' সে কথা কোনোদিনই ভুলব না। এমনই ছিলেন মাস্টারমশাই দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে আমার বাড়ীর কথা মনে বড়ে। আমাদের বাড়ীতে তখন সাত - আটজন ইয়ং মেয়ে ছিল। এরা যখন কলকাতায় যেতো তখন ওদের দেখতাম। চান করে ফেরবার পথেও দেখতাম। আমার চোখ কান সারাক্ষণ খোলা থাকতো, ফলত সর্বক্ষণই প্রায় শুনতে পেতাম ও দেখতাম চারপাশে ঘটে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে। সে কারণেই আমি নিজেকে সমাজসচেতন শিল্পী বলে মনে করি এবং দাবী করি।" পরিতোষবাবুর এই দেখা প্রসঙ্গ নিয়েই রচিত হয়েছে 'জিন্দাবাহার' এর একটি বিশেষ অধ্যায়। গল্পটির নাম ন'বাবু, সেজোবাবু। বইটি না পড়লে বোঝানো অসম্ভব এই শিল্পীর নিপুণতাকে।

এই'জিন্দাবাহার' বইটি কী? কী-বা তার পিছনের ইতিহাস? আসা যাক 'জিন্দাবাহার' -এর ঘটনায়—পরিতোষ সেন-এর বয়স তখন ঊনষাট বছর। একদিন 'কবিপক্ষ' পত্রিকার তরফে কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও সন্দীপ সরকার নাছোড়বান্দা হয়ে পরিতোষকে বললেন— ''আমরা নীরদ মজুমদার-এর বাল্য স্মৃতি প্রকাশ করেছি, আপনাকেও একটা ছেলেবেলার কথা লিখতে হবে এবং সেটি 'কবিপক্ষ' পত্রিকায় ছাপা হবে।" পরিতোষবাবুও মনস্থির করলেন সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে জমে থাকা ইতিহাস তিনি লিখবেন। শুরু হল জিন্দাবাহার -এর যাত্রারম্ভ। পরিতোষদার কথায়— ''লেখা শুরু করতে গিয়ে আমি ভাবলাম একজন আর্টিস্ট হিসাবে দীর্ঘদিন ছবি আঁকছি। তাছাড়া প্রতিকৃতি চিত্র আঁকাই আমার অন্যতম নেশা। যখনই যাকে কাছে পেয়েছি, তারই প্রতিকৃতি এঁকেছি, বহুবার এঁকেছি নিজেকেও—আজও আঁকি। তাই মনে মনে স্থির করলাম শব্দ দিয়ে পোট্রেট আঁকবো—তৈরী করবো একটা ভিস্যুয়াল প্রোজ। প্রথম দিকে প্রচেষ্টা কাজে এল না ঠিকই, সমালোচনা ও সমাদর পেলাম দু'একটি লেখার যা বন্ধুদের পড়তে দিয়েছিলাম সেগুলোর জন্য। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র - পত্রিকা যেমন— অমৃত, এক্ষণ, কৃত্তিবাস ইত্যাদিতে ছোট ছোট আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সমস্ত লেখাগুলিরই সম্মিলিত ফসল হল এই 'জিন্দাবাহার। ' লেখকের এই লেখার পাঠ ঢাকার একটি ক্যাম্পে শুনে শওকত ওসমান মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন— 'এরকম ভিস্যুয়াল প্রোজ' হুতোম পাঁচার নকশা'র পরে আর পড়িনি।"

স্মৃতির সরণি বেয়ে আবার একটু পৌঁছে যাওয়া যাক পরিতোষ সেন- এর মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের শিক্ষাপর্বের সময়ে। আমরা শিক্ষাপর্ব আলোচনা করতে করতে ঢুকে পড়েছিলাম শিল্পীর রচিত 'জিন্দাবাহার' বইয়ের ঘটনায়। আত্মমগ্ন ছিলাম বইটির লেখনীয় বিষয়বস্তুতে। শিক্ষাপর্বের এবং কর্মজীবনের ঘটনা শেষে পুনরায় ফ্ল্যাশব্যাকে আবার না হয় পৌঁছে যাব। 'জিন্দাবাহার' -এর ঘটনা ছাড়াও অন্যান্য রচনাতে। আর্ট স্কুলে পাঠ নেওয়ার সময় গুরু দেবীপ্রসাদ এবং তস্য গুরু অবনীন্দ্রনাথ -এর প্রভাব তরুণ পরিতোষ -এর ছবিতে দেখতে পাই। যখন তিনি ওয়াশে এঁকে চলেছেন মোগল বাদশাহদের কাহিনিভিত্তিক ছবির পাশাপাশি 'তুলসীমূলে', 'তালবীথি' ইত্যাদি ছবি যা তখনকার বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

১৯৩৯ আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় ফিরলে দাদাদের গঞ্জনা মুহূর্মুহূ শুনতে হয়। তাঁরা মন্তব্য করেন— 'ছবি এঁকে কিস্‌সু হবে না।' মাদ্রাজে থাকতেই তিনি শুনেছিলেন সাহেবরা ছবি কেনে। ফলত একদিন ছবির গোছা নিয়ে চলে যান সাহেবদের বাড়িতে। বিক্রিও হয় পরিতোষদার ছবি। প্রথম বাড়িতে গলা খাঁকারি আর গালমন্দ জুটলেও অন্য এক সাহেবের বাড়িতে ৩০টাকায় একটি ছবি বিক্রি হয়। একটু ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলেই আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত সাহেবদের পছন্দ ছিল ঘরের দেওয়াল সুসজ্জিত রাখার জন্য ফুলের তোড়া, ফ্লাওয়ার ভাস, ঘোড়া, কুকুর পাখি (বিশেষত ময়ুর), ল্যান্ডস্কেপ ইত্যাদি। বার্ষিক প্রদর্শনীগুলোতে সাহেবদের উপস্থিতি সে সময় আমাদের বেশ চোখে পড়ে।

এই সময় পর্বেই আমরা দেখতে পাই পরিতোষদা ছবির গোছা নিয়ে হাজির হয়েছেন লাহোরে ভবেশচন্দ্র সান্যালের স্টুডিওতে। সারা বছরই প্রায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ছবির প্রদর্শনী করতে পরিতোষদাকে দেখতে পাই। এক সময় অর্থাৎ ১৯৪০ -এর মাঝামাঝি যখন পরিতোষদা হন্যে হয়ে ঘুরছেন চাকরির খোঁজে সে সময় হঠাৎই একদিন দেখা পান শিল্পীর সুধীর খাস্তগীর মহাশয়ের। তিনি যে তখন চাকরি খুঁজছেন সে কথা শোনামাত্র বললেন— 'ইন্দোরে আর্ট টিচার প্রয়োজন — যাবে সেখানে?' এককথায় রাজী হয়ে সাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠালে ইন্টারভিউ হয় এবং চাকরি জোটে।' কলকাতা থেকেই ইন্দোর যাতায়াতে সময় লাগত প্রায় ৪০ ঘন্টার কাছাকাছি। ইন্দোরে ডালি কলেজে পরিতোষদা ছিলেন সুদীর্ঘ দশ বছর (১৯৪০ - ১৯৪৯)। ওখান থেকে নিয়মিত তিনি কলকাতায়ও আসতেন। যুদ্ধের সময় বাধ্যতামূলক সমরসেবায় এক ঝাঁক ব্রিটিশ ও মার্কিন ছাত্র আকঁতেন। কলকাতার তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে বৃটিশ ও মার্কিন ছাত্র শিল্পীদের আলোচনা হত। স্থানীয় তরুণেরা হালফিল ইউরোপীয় শিল্পকলার হালহদিশ পান তাঁদের কাছেই। এদেশি তরুণ শিল্পীরাও ছবিতে সাবেকী পুনরাবৃত্তির ছক ভাঙার সাহস সেই আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয়ের দরুন পান। শিল্পী - ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত ইতিমধ্যে বিলেত থেকে ফিরে এসে লন্ডনের আধুনিকতাবাদী শিল্পীগোষ্ঠী 'লন্ডন গ্রুপ'-এর মতো ক্যালকাটা গ্রুপ তৈরিতে উৎসাহিত হয়ে পড়েন। পরিতোষ সেন, সুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, গোপাল ঘোষ কমলা দাশগুপ্ত প্রমুখকে নিয়ে ১৯৪৩ এ নতুন এই নতুন দল বা ক্যালকাটা গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী হয় যুদ্ধে অধিগৃহীত কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে। পরপর এই গ্রুপের প্রদর্শনীতে পরিতোষ সেন -এর ছবিতে পরিবর্তন দেখা যেতে থাকে। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাগুলি ক্রমশ প্রতিফলিত হতে দেখা যায় একের পর এক কাজের মধ্যে দিয়ে। পূর্বতন রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ ছবি ক্রমশ দূরে সরতে থাকে। এই সময়েই তিনি ওয়াশ ও তেল রঙ পদ্ধতিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন। মৃদুচ্ছায়ে মেদুর রঙের বদলে পোস্ট - ইম্প্রেশনিস্টদের মতো উজ্জ্বল রঙের তুলির ছোপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর আঁকা 'থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট', 'জামাইকান গার্ল', 'টু সিস্টার্স' প্রভৃতি ছবিগুলি।

১৯৪৯ -এ ফরাসি সরকারের স্কলারশিপে পাঁচবছরের জন্য প্যারিসে পাড়ি জমান। এ সময়কালে একাডেমি দ্য লা গ্রাঁদ সমিয়ে ও একোল দ্য বোজার -এ ভিত্তিচিত্র ও শিল্পকলার ইতিহাসের পাঠ নেন। অ্যান্দ্রে লোৎ ও ফারন্দ লেজার -এর স্টুডিওতে অনুশীলন করেন। সান্নিধ্য লাভ করেন আধুনিকতার দুই পুরোধা পুরুষ শিল্পী পিকাসো ও ব্রাঙ্কুসির। পিকাসোর সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বটি আমাদের ভারতীয় শিল্পীদের কাছে একটা myth-এর পর্যায়ে চলে গেছে। যদিও কথাগুলি তিনি তাঁর এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে 'আবুসিম্বাল পিকাসো ও অন্যান্য তীর্থ' লিখেছেন তথাপি পাঠক - পাঠিকাদের সুবিধার্থে ঘটনাটির পুনরুল্লেখ -এ ব্যক্ত করলাম। 'ভারতবর্ষ' শব্দটির সমতুল্য শুধু যে একটি নামের উল্লেখ করা যেতে পারে সেকথাও প্রমাণিত হয় পরিতোষ সেনের সাক্ষাৎপর্বের সূচনায়। আর বাঙালি হিসাবে আমাদের মন আরও গর্বে ভরে যায় যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদেরকে কতভাবে - কত পরিক্রমায় এই ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করে গেছেন। আসা যাক শিল্পী পরিতোষ সেনের সেই বিশ্বখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনায়— ''পরিতোষদা পিকাসোর স্টুডিওতে উপস্থিত হয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব - এর সঙ্গে কথা মারফত জানতে পারেন শিল্পী নেই সুতরাং দেখা হবে না। ব্যর্থ মনে ফিরতে যাচ্ছেন তখনই প্রশ্ন— ''You are coming from which country?" উত্তরে পরিতোষদা 'India' শব্দটি উচ্চারণ করামাত্র সচিব আবেগ বিহ্বলতায় বলে ফেলেন, ''Oh, you are from Tagore's country. Yes, Yes Picasso is here and I will call him just now." সুতরাং খুব সহজেই অনুমেয় হল আমাদের কী ভীষণ নাটকীয় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে পরিতোষদার সঙ্গে পিকাসোর সাক্ষাৎকার

ঘটে। আর তারপরের ঘটনা তো বলবার অপেক্ষাই রাখে না। তবে প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্তিগত সচিবের রবীন্দ্রনাথের প্রতি এত শ্রদ্ধার কারণ আসলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন স্পেনদেশীয়। আর ওই মুহূর্তে স্পেনীয় ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটির রূপান্তরকরণে তিনি ছিলেন ব্যস্ত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানবার আশায় পরিতোষদা সেদিন প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই খাতির যত্ন পেয়েছিলেন এবং এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষীও হয়েছিলেন। পিকাসো ছিলেন স্পেনদেশীয় সুতরাং ব্যক্তিগত সচিব স্পেনদেশীয় হবেন সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই স্বভাবিক।

উনিশশো চুয়ান্নতে পরিতোষদা দেশে ফেরেন এবং তাঁর ছবিতে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের আঁকা 'সরোদপ্লেয়ার', 'টয়লেট', 'বয় ইটিং ওয়াটারমেলন' প্রভৃতি ছবিতে কিউবিজমের জ্যামিতিক তলবিন্যাস এবং রেখার বিভিন্নরকম বিভাজন আমাদের চোখে পড়ে। বছর দু'য়েক চুটিয়ে ছবি আঁকার পর পরিতোষদা ছাপান্নতে যাদবপুর রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অফ প্রিন্টিং টেকনোলজিতে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। এখানে সুদীর্ঘ তেইশ বছরের অধ্যাপনা পর্ব শেষ হয় উনিশশো উনআশিতে। এখানে কাজ করার সময় বাংলা হরফ নিয়ে গবেষণা করেন এবং গবেষণাকালে তাঁর মনে হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার ছাঁচে হরফ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। ফরাসি সরকারকে বিষয়টি তিনি জানালে সে সরকার তাঁকে দিয়ে এই কাজটি করিয়ে নেয়। নদীর বিচিত্র ধারার মতো অনবরত পরিতোষদার ছবিতে দিক পরিবর্তন ঘটলেও কখনই তিনি বিশুদ্ধ বিমূর্তবাদ বা অ্যাবস্ট্রাকশন -এর পথে হাঁটেননি। পরিবর্তে মানবজগৎ ও প্রাণীজগতের ভাবভঙ্গি সঙ্গতি-বিসঙ্গতি প্রভৃতি ব্যাপারগুলি তাঁর ছবিতে স্বাভাবিকভাবে এসেছে। তাইতো আমরা দেখি পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি বা ষাটের দশকের প্রারম্ভে পরিতোষ সেন -এর ওয়াশের ধরনে রঙ লাগানো একটা সিরিজ। যেখানে তাঁর রঙ লাগাবার ধরনে এক চরম স্ফূর্ততা দেখতে পাই। কোনো ইমেজেই সেখানে তিনি পার্শ্বরেখা ব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র ইমেজের মধ্যে কিছু রেখা দিয়ে রূপটিকে স্পষ্টতর করে তুলেছিলেন। রূপের জাগরণকে ফুটিয়ে তুলতে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের মতো চওড়া তুলির অবাধ সঞ্চালন ষাটের দশকের ছবিতে একটা বিরাট ভূমিকা নেয়। 'পোট্রেট অফ এন অ্যানিম্যাল', 'উন্ডেডম্যান', 'বড়ে গুলাম আলি' প্রভৃতি ছবি এই সময়কার ফসল। এখানে একটা জিনিস খুবই আশ্চর্যের অনেক শিল্পীই এ সময়ে কমবেশি বড়ে গুলামআলিখানের প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে ও ছবিতে ধরেছেন এর মধ্যে রয়েছেন রামকিঙ্কর বেউজ, শর্বরী রায়চৌধুরী, পরিতোষ সেন প্রমুখ।

আবার একটু স্বাদ বদলাতে আমরা একটু 'জিন্দাবাহার -এর পর্ব যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকেই ধরা যাক—পরিতোষদার বাবার মৃত্যু খুবই ছোটো বয়সে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সেটাকে তিনি সুদক্ষ বর্ণনাকারের মতো ব্যাখা করেছেন এবং পাশাপাশি সেজদার মদ ও জুয়ার নেশা, ধার করে কামের মিলন প্রভৃতি গুণাবলী প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠা, ন'দার বারবণিতাদের প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতির ঘটনা সুদক্ষ শিল্পীর মতো শব্দ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটু ন'দার কথায় আসা যাক। পরিতোষদার বর্ণনামতো— 'শীতের শেষ বসন্তের শুরু, হরিমতী বাঈজীর ঘরটি আমাদের বারান্দা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। সেদিনও প্রতিদিনকার মতো ভৈরবী রাগিণীতে গান ধরেছেন তিনি— ''রসিয়া তোরি আঁখিয়ারে, জিয়া লালচায়।'' জিন্দাবাহার গলিটি কানায় কানায় ভরে উঠেছে ঠুংরি ঠাটের গানের কলিটির মাধুর্য আর হাফিজ মিঞার কয়েকটি মরদ পায়রা বাকবাকুম আওয়াজে ছাদ গমগম করছে আর এদিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ন'দা নতুন সিল্কের ইস্ত্রি করা সার্টটি গায়ে দিয়ে গলির মুখে উঁকিঝুঁকি মারছে। খুব স্বাভাবিকভাবে আমার মনেও প্রশ্ন জাগে কী ব্যাপারটা, দেখা যাক তো?'' দেখলাম আমাদের পাড়ার বারবণিতারা প্রতিদিনকার মতো আজও স্নান করে ফিরছে। উল্লেখ্য তাদের স্নানকরে যাবার পথটি ছিল আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে। আর ভেজা কারণে ফেরবার পথে তারা আমাদের গলির মুখে অবস্থিত কালীমন্দিরের দরজায় প্রণাম করতো। ফলত, বারবণিতাদের ভেজা কাপড়ে গায়ে সেটে লেগে থাকা কাপড় পড়ে প্রমাণ করার দৃশ্যটি সকালবেলায় পুরুষদের চোখ এবং মন দুটোকেই বেশ পরিতৃপ্ত করতো। দিনটিও কার্যত ভালো কাটতো বলা যায়।'

'জিন্দাবাহার' গ্রন্থটির 'হে অর্জুন' লেখাটিতে পরিতোষদার ছবি আঁকার পছন্দের বিষয়বস্তুর সুন্দর বর্ণনা আমরা পেয়ে যাই। শুধু নারীদেহই নয় এই পৃথিবীর সৃষ্টির কোনোদিকই তাঁর নজর এড়ায়নি। সুতরাং মানবদেহের পাশাপাশি ছবি ধরা পড়েছে সাপ, ব্যাঙ, বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়। জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি। এছাড়াও পরিতোষ সেন নিজের আত্মপ্রতিকৃতি এঁকেছেন নানান রকমের ও নানানভাবে। বৈচিত্র্যে ভরপুর সেই প্রকৃতিগুলো আমাদেরকে ভীষণভাবেই নাড়া দেয়। এ প্রসঙ্গে নিজেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে— ''বারে বারেই আত্মপ্রতিকৃতি আঁকি। কারণ নিজেকে দেখা প্রতিদিনকার পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নাড়া দেয় প্রতি মুহূর্তে। পাল্টে যাচ্ছি প্রত্যেকদিনই। এমন মস্করাও নিজেকে নিয়ে মাঝে মাঝেই করে চলি। যেমন আমার একটি ছবি আছে 'লেডিস স্পেশাল' শিরোনামাঙ্কিত। সেখানে শুধু লেডিসদেরই জন্য একটি বাস এঁকেছি আর আমিও এই বয়সে ছুটে চলেছি সেই বাসেরই পিছন পিছন। ওটা ধরার চেষ্টা করছি যতই; ততই ওরা হাসছে। এই ছবিতে আসলে আমার কাজ করছে পড়ন্ত যৌবনে যৌবন হারাবার ব্যঙ্গ। আর আজও সে মেয়েদের দিকে তাকাতে ভালোবাসি এ হল তার মস্করা।'' এই লেখাতে ব্যবহৃত 'আত্মপ্রতিকৃতি' শীর্ষক ছবিতে পরিতোষদা ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে সাদা - কালোয় যে আবক্ষ প্রতিকৃতি এঁকেছেন তার মধ্যে শিল্পী মানুষটির ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বভাবযোগ্য অস্মিতা প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে তাঁর চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবু যেন তিনি দর্শকের দিকেই তাকিয়ে আছেন। স্বল্প সীমিত রেখার অনায়াস খেলাই যে প্রকৃতপক্ষে এই ছবির গুণ।

লেখাটিতে ব্যবহৃত অপর একটি পরিতোষদার বিখ্যাত ছবি 'দ্য ব্যাবল রাইজার'-এ তিনি ১৯৫১ তে একটি তরমুজের ফালি হাতে বালকের ছবি এঁকেছিলেন। ২০০৫ -এ পৌঁছেও তিনি একই বিষয়ে একটি ছবি এঁকেছেন দেখতে পাই। চুয়ান্ন বছরের ব্যবধানে আঁকা একই ভঙ্গিতে তরমুজের ফালি ও ভুট্টা হাতে বালকের দুটি ছবি ছিল। একান্নতে আঁকা একই বিষয়ে ছবির পাশে হালে আঁকা ছবিটি রাখলেই আমরা তার শৈলীর অসাধারণ বিবর্তন লক্ষ করি। আগের ছবিটির টানটান রেখা তৎকালীন ফরাসি ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু হালে আঁকা ছবিটির রেখা স্বল্প, অঙ্কন অত্যন্ত অনায়াস এবং এতে যুক্ত হয়েছে কৌতুক। তাঁর 'দ্য র‍্যাবল রাইজার' ছবিতে পট জুড়ে দেখা যায় গান্ধিটুপি পরিহিত স্থূলকায় আবক্ষ নেতার মুখ আর সামনে একাধিক মাইক। বক্তৃতার ভঙ্গিতে এক হাতে তর্জনী তোলা। এই নেতার মুখভঙ্গি কৌতুকপ্রদ হলেও এই ছবিতে শিল্পী এঁকেছেন একালের রাজনীতির চেহারা। ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের শতবর্ষ পরে দেশ আজ কাদের হাতে, এই ছবিটি সেই প্রশ্নই তোলে। এই ছবিতে তিনি কোনো রূপকার্যের পরিবর্তে একটি সরাসরি সেটমেন্ট বা বাণীকে তুলে ধরেছেন বলা যায়। বলাবাহুল্য তাঁর 'বয় উইথ ওয়াটারমেলন' (১৯৫১), 'উন্ডেডম্যান' (১৯৬৮), 'বড়েগুলামআলি' (১৯৬৮), 'অ্যাক্সিডেন্ট' (১৯৭২), 'দ্যা টানেল' (১৯৭৩) ইত্যাদি ছবির পাশে তাঁর হালের ছবি এই বার্তাই পৌঁছে দেয়। আমরা খুব সহজেই জানি বারবার নিজেকে অতিক্রম করে যাবার সচলতাই শিল্পীর ধর্ম ও জীবন।

১৯৭০ সালের পরিতোষ সেন জন. ডি. রকফেলার থার্ড গ্রান্টে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে যান। আবার তিয়াত্তরে ফিরে আসার পর আমেরিকার উর্ধ-শ্বাস জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর 'অ্যাক্সিডেন্ট' শীর্ষক সিরিজে দেখা যায় যেখানে তিনি এক সর্বনেশে আত্মহননের পথ মানুষকে দেখিয়েছিলেন। বিশাল সুরঙ্গপথের দু'দিক থেকে পরস্পরের দিকে মোটর সাইকেলে ধাবমান একই মানুষের দ্বৈত সত্ত্বাকে এই ছবিতে দেখিয়েছেন।

আমরা আমাদের দেশের শিল্প ইতিহাসের পাতা একটু ওল্টালেই দেখতে পাই ১৯৭০ -এ বা সত্তর দশকের প্রারম্ভে আলোকধ্বনিসমন্বিত ইনস্টলেশান করেছিলেন। সেই ইনস্টলেশানেও সাইকেলে ধাবমান আত্মপ্রতিকৃতি তিনি রচনা করেছিলেন। শিল্পী

ও শিল্প ঐতিহাসিক ড. শোভন সোম - এর মতে— ''এই প্রদর্শনীতে তিনি কাগজে তৈরী ভাস্কর্যও রেখেছিলেন। অমন বিশাল ভাস্কর্যও কলকাতায় কোনও প্রদর্শনীতে আগে দেখা যায়নি। সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে নকসাল আন্দোলন, রাজনৈতিক বাতাবরণ, মানুষের প্রতিবাদহীনতা তাঁর ছবিতে রূপকার্থে দেখা দিতে থাকে। কল্লোলিনী মেট্রোপলিটান সুসভ্য কলকাতায় বস্তিবাসীর ভরসা রাস্তার টিউবওয়েল আর উদলা - গা মেয়ে পথে স্নান করতে বাধ্য হয় অথচ বিশালকায় নেতা গলাভর্তি মালা পরে সু-ভাষণ দেন ও কীটপতঙ্গের মতো জনতা তা শুনে নৃত্যোল্লাসে মাতে, এসব দৃশ্য তাঁর ছবিতে উঠে আসতে থাকে।''

'দেশ' পত্রিকার 'শিল্পসংস্কৃতি' বিভাগে পরিতোষ সেন - এর চলে যাওয়ার পর এক অসাধারণ রচনা শোভন সোম আমাদেরকে উপহার দেন। যেখানে একটি স্থানে তিনি লিখেছেন— 'দু'হাজার সালের পর থেকে তাঁর ছবিতে সমকালীন নানা দৃশ্য নতুন শৈলীতে দেখা যায়। যেমন সাগরস্নানে আসা স্কুটার আরোহী ছাইমাখা নাগা সন্ন্যাসীদের চোখে সানগ্লাস, কানে সেলফোন ছবিতে তিনি দেখালেন এদেশে আমরা একইসঙ্গে অতীতেও আছি, বর্তমানেও আছি। কলকাতার রাস্তায় সাইকেলে হেটমুন্ড মুরগীদের ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অসহায় নারীরা ফুটপাতে কুকুরের পাশে শোয়। ব্যঙ্গের ভাষায়, কখনও কৌতুকের ভাষায় মানুষের প্রতি প্রগাঢ় দরদের অন্তঃপ্রবাহ তাঁর ছবিতে প্রকাশ পেতে থাকে। শেষদিকে তাঁর রঙ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। তাঁর অঙ্কন হয়ে ওঠে পটপুতুল লোকশৈলীর মতোই সাবলীল। নিজেকে নিয়েও মজার ছলে শেষদিকে তিনি একেঁছেন অজস্র অত্মপ্রতিকৃতি।'

সারাজীবন ধরে পরিতোষদাকে অজস্র নারীদেহের ছবি আঁকতে দেখতে পাই। ধ্যান দিয়ে সেইসব ছবিতে তিনি চেষ্টা করেছেন সেক্সুয়াল কোয়ালিটি কতটা প্রবলভাবে দেখানো যায় সেটা ধরতে। এককথায় তাঁর মতে— 'টু শো দ্যা ম্যাক্সিমাম স্যাচুরেশন অব ফিমেল বডি।' আমরা দেখি শরীরের বেশিরভাগ ছন্দই নারীদেহে লুকিয়ে থাকে, আর সেটাকেই পরিতোষদা বারবার নানারূপে নানান অভিব্যক্তিতে রূপায়িত করেছেন দেখি। বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি পরিতোষদার একটি বিখ্যাত ছবি 'ওম্যান অ্যান্ডার দ্য শাওযার' দেখলে। সে সময়কার মরোক্কোর সুলতানের ভাগ্নি কুমারী চেলিয়া রশিদকে স্নানঘরে দেখার অভিজ্ঞতাই ছবিটিতে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও যৌনচেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে -সব বিফোর দ্য মিরর' ছবিটিতেও। আমরা জানি ফিমেল ফিগার-এ সেক্সুয়ালিটি বরাবরই আছে আর নারীদেহকে সবাই ঈশ্বরের আশ্চর্য সৃষ্টি হিসেবেই দেখিয়েছেন এবং বর্তমানেও দেখাচ্ছেন। তাকে নিয়ে যত কল্পনা জল্পনা হয়েছে তা আর কাউকে নিয়ে হয়নি। এর একটা প্রধানতম কারণ, নারীদেহ হল এমন একটা ব্যাপার যাকে সহজে নোয়ানো, বাঁকানো বা ভাঁজ করা যায় এমন। নারীর শরীরে রয়েছে নমনীয়তা— যে কারণে তাকে নানা ভঙ্গিতে মিশে গেছে এই প্লায়াবল নেচার যা এককথায় বলা যায় আবহমান কাল ধরে সে তার শরীরে বহন করে আসছে। আমরা আজীবন ধরে নারীদেহের পূর্ণাঙ্গ সৌষ্ঠব এবং তার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য নিয়ে অভ্যাসচর্চা বিভিন্ন মাধ্যমে করে গেলেও তার দেহের পরিপূর্ণ সৌরভকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে বোধহয় কোনো শিল্পীই পারেননি। নারীদেহের বিচিত্র রহস্যময়তা শুধুমাত্র পরিতোষদার কথায় ও কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেনি— ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের কাজের মধ্যেও।

শিল্পী বিষেণ দাস-এর 'এনায়েত খাঁর মৃত্যু' ছবিটি পরিতোষদাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। রঙিন এবং সাদাকালো (ড্রইং) দুটিই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বোস্টন ও অক্সফোর্ডে দেখার সময়ে। সাদাকালোর বৈথিক ছবিটিই পরিতোষদার বিশেষ প্রিয় ছিল এবং বারংবার তাকে টানত। ফলত, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এবং লেখায় ছবিটির বিষয় আলোচনা দেখতে পাই। এনায়েত খাঁর প্রতি শিল্পীর এক গভীর ভালোবাসা জন্মেছিল সে কথার প্রমাণ পাই পরিতোষদার কথায়— এনায়েৎ খাঁ সম্পর্কে আমি নানা কারণে আগ্রহী হয়ে উঠি। তার সম্পর্কে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজেছি। এনায়েত ছিল জাহাঙ্গীরের প্রিন্স সেলিম ছিল তখন এনায়েতই ওকে আফিং, মেয়েছেলে সব জোগাড় করে দিত। একসময় নিজেও আসক্ত হল নোয়েৎ। আজ বুঝি ওর সিরোসিস অফ লিভার হয়েছিল। মৃত্যু চেতনার এমন অনবদ্য ছবি আমি দেখিনি। তবে সম্প্রতি ছবির শিল্পী নিয়ে অনেক দো-টানার সৃষ্টি হলেও আমি বিশ্বাস করি এটি বিষেণ দাস-এরই আঁকা ছবি। মৃত্যুকে সামনে রেখে একটা লোক তাকিয়ে আছে, এটা অদ্ভুত ফিলিংস একটা প্রতিকৃতির মধ্যে জানা বড় সোজা কথা নয়।''

পরিতোষদাকে আমরা দেখেছি— চোখের সামনের সুবিস্তৃত জগতকে নানা রঙে রেখায়, আনন্দ - কৌতুকে আবার পাশাপাশি দুঃখ-গাম্ভীর্যে আমাদের মর্মে পৌঁছে দিয়েছেন। পিকাসোর অনুপ্রেরণাতেও তিনি এঁকেছেন অনেক ছবি। এখানে রঙের উজ্জ্বলতা লক্ষণীয়। ধূসর ছাই বর্ণে তাঁকে আঁকতে দেখা গেছে জাহাঙ্গীর বাদশার মুমূর্ষু বন্ধু এনায়েৎ খাঁর রোগজীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা। পরমূহূর্তে দেখা যায় তিনি কোনও নারীর সঙ্গে যে রহস্যালাপ করছেন। তার ঝলক ওই রমণীর মুখে বিভাসিত।

পরিতোষ সেন - এর অষ্টআশিতম জন্মদিন উপলক্ষে আমরা দেখতে পেয়েছি কলকাতার গ্যালারি -৮৮ ও তাজ বেঙ্গল হোটেলে অষ্টআশিটি ছবির প্রদর্শনী। প্রায় সারা জীবনের বিখ্যাত বিখ্যাত কর্মপসরাকে উপস্থিত করা হয়েছিল এদিনের প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনীটি চলেওছিল বেশ কিছুদিন ধরে। এই প্রদর্শনীটি উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকায় শিল্পসংস্কৃতি বিভাগের ড. শোভন সোম মহাশয় তাঁকে এবং তাঁর কাজকে যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তেমনটি যে আর কোনো শিল্প ঐতিহাসিক বা শিল্পবিশেষজ্ঞ করেননি সেকথা হলফ করে বলা যায়। লেখার কিছুটা অংশ পুনরায় পাঠক - পাঠিকাদের সুবিধার্থে তুলে ধরা হল— 'তিনি বহু প্রজন্ম দেখেছেন ও প্রতিটি প্রজন্মের সমান বয়সী থেকেছেন। অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী, অমৃতা শেরগিলের পর যে তরুণ তুর্কিরা প্রশ্নহীন অনুসরণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে শিল্পকলাকে সচল প্রবাহ হিসেবে দেখতে তৎপর হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পরিতোষ সেন। ক্যালকাটা গ্রুপ সংগঠিত হয় ১৯৪৩-এ এবং আজকের ঢক্কানিনাদিত বোম্বে প্রগ্রেসিভ গ্রুপ তৈরি হয়ে আরও ছয় বছর পরে, গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বোম্বেতে আয়োজিত ক্যালকাটা গ্রুপের প্রদর্শনীর অনুপ্রেরণায়। অথচ আজ ইতিহাসকে বিকৃত করে সেই সত্যকে পালটে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সুচিত্রকর পরিতোষ সেনের ছবি এই কথা বলে যে, মানুষ অন্তরে সজীব, তাঁর ছবিতে বয়সের ছাপ পড়ে না। বয়স বরং তাঁর ছবিকে আরও পরিণত করেছে। পরিতোষ সেন সুলেখকও। তিনি এদেশের আধুনিক চিত্রভাবনের শরিক এবং দর্শক দুই-ই। ভারতীয় শিল্পকলার সেই আধুনিকতার ইতিহাস আমরা তাঁর কলম থেকে প্রত্যাশা করি।'

পরিতোষ সেন - এর উল্লেখযোগ্য লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম 'আমসুন্দরী ও অন্যান্য রচনা', আলেখ্যমঞ্জরী, 'আবুসিম্বাল', 'পিকাসো' ও অন্যান্য তীর্থ, শিল্পকথা, দ্য নবাব এন্ড হিজ ম্যাঙ্গো আর্চার্ড ইত্যাদি। 'শিল্পী মানসের স্বাক্ষর' শিরোনামে ১৭ আগস্ট ২০০৭ -এর দেশ পত্রিকায় রবীন মন্ডলের 'শিল্প ভাবনা' বইটির রিভিউ করতে গিয়ে এক অনবদ্য গদ্যধারা প্রবন্ধাকারে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও আমরা শেষ উল্লেখযোগ্য রিভিউ হিসাবে পেয়েছি তাঁদের উল্লেখযোগ্য লেখা 'দেশ' পত্রিকার বইমেলা সংখ্যায়— 'আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের জনক রামকিঙ্কর' শীর্ষক লেখাটি।

বেশকিছুদিন রোগ শয্যায় থেকে পরিতোষদা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু যে সেতুবন্ধন আজকের প্রজন্মের সঙ্গে রেখে গেলেন সেটা আরও সুদৃঢ় হত যদি শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন -এর সঙ্গে সম্মিলিত প্রয়াসে শেষ করে যেতেন বিশ শতকের আধুনিক শিল্পকলা বিষয়ের বইটি। বিষয়টি প্রস্তাবিত ছিল কিন্তু সময়ের অমোঘ নিয়মে সরে গেলেন। এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। জানি না আগামীতে এই ক্ষতের প্রলেপ অন্য কোন্ শিল্পীর হাত হতে আসবে? সেই আশার পালে ভর করে আমাদের চরৈবেতি মন্ত্রকে আবার আপন করে নিয়ে এগিয়ে চলা।